বাংলাদেশ বিমানে দুর্নীতি

১৯৭২-২০০৬

আলমগীর সাত্তার

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সম্পর্কে কখনো বিরূপ কিছু লিখবো না বা বলবো না, এটাই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে আমার আবেগমথিত এক সম্পর্ক। ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা ফ্লাইটের মধ্যদিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশ বিমানের যাত্রা। সেই দিন বিমানের উদ্বোধনী ফ্লাইটের তিনজন পাইলটের মধ্যে আমিও ছিলাম। অন্য দুই সহযোগী পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেক (মরহুম) এবং ক্যাপ্টেন মুকিদ। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আমরা তিনজন এক সঙ্গে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে সাহসীকতাপূর্ণ অবদানের জন্য তিনজনই বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছিলাম।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগে থেকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি জাতীয় বিমান সংস্থার (এয়ারলাইন্স) স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে (পিআইএ) অন্য যেসব বাঙালি চাকরি করতেন তারাও প্রায় সবাই মনের মধ্যে এমন একটি ইচ্ছে লালন করতেন। তখন আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, এদেশের (তখন পূর্ব পাকিস্তান) জন্য একটি আলাদা বিমান সংস্থা হলে আমরা সেটি বেশ লাভজনকভাবেই চালাতে পারবো।

আমরা বৈমানিকরা যখন আলাদা বিমানসংস্থার স্বপ্ন দেখতেই দেখতেই একসময় এসে গেলো ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চ! বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে বাঙ্গালী জাতির সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ততদিনে স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে ধাবিত। আমরা পিআইএর বাঙালি বৈমানিক (পাইলট) ও প্রকৌশলীসহ (ইঞ্জিনিয়ার) অন্যান্য পেশার কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও গভীর আগ্রহ-উত্তেজনা নিয়ে ওই আন্দোলনে যোগ দেই।

তখন পিআইএ'র ড্যাটা প্রসেসিং বিভাগের প্রধান ছিলেন তালুকদার নামের একজন বাঙালি অফিসার। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনিও ঢাকায় ছিলেন। তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে পিআইএকে ভাগ করে, বাংলাদেশের জন্য একটি আলাদা এয়ারলাইন গঠনের দাবি তোলা উচিত। বঙ্গবন্ধুকে বলতে হবে, তিনি যেন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময় বাংলাদেশের জন্য আলাদা এয়ারলাইন গঠনের দাবিও করেন। তিনি আরো বলেন, কাগজপত্র তৈরি করে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে বলতে হবে, আলাদা একটা এয়ারলাইন প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা সেটাকে লাভজনকভাবে চালাতে পারবো।

মি. তালুকদার, ইঞ্জিনিয়ার পাটোয়ারী, ক্যাপ্টেন খালেক ও ক্যাপ্টেন আলমগীর আরো দু-এক জনকে সঙ্গে নিয়ে দৈনিক ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা পরিশ্রম করে কয়েকদিনের মধ্যেই কাগজপত্র সব প্রস্তুত করে ফেললেন। আমাদের প্রস্তাবিত এয়ালাইনের নাম দেওয়া হলো- 'এয়ার বাংলা ইন্টারন্যাশনাল'। স্বাধীনতার পর জেনারেল ওসমানী বললেন, আমাদের এয়ারলাইনের নামকরণ বাংলায় করা হবে। তিনি নাম দিলেন বিমান বাংলা। পরে তা সংশোধন করে রাখা হলো 'বাংলাদেশ বিমান'। আরো পরে দ্বিতীয় দফায় সংশোধন করে নামকরণ হলো 'বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স।'

যাই হোক, আমাদের স্বপ্ন-পরিকল্পনায় ফিরে আসি। একাত্তরের ২৩ মার্চ পিআইএ'র বেশ কয়েকজন পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মচারীসহ আমরা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। ওই দিন বাড়িতে প্রচন্ড ভিড় ছিল। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু আমাদের সময় দিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে আমাদের সব কথা শুনলেন। আমরা যখন আলাদা এয়ারলাইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের তৈরি করা নথিপত্র বঙ্গবন্ধুর হাতে দিতে গেলাম তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বরং হাসতে হাসতেই দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, দেশটাই তো আলাদা করে দিচ্ছি! কিসের আবার আলাদা এয়ারলাইন? দেশ স্বাধীন হলে ওটা তো এমনিতেই হবে!

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আমি টানা ত্রিশবছর বিমানে পাইলট হিসেবে চাকরি করেছি। পেশাগত জীবনে ব্যক্তিগত যা কিছু অর্জন করেছি সবই এই এয়ালাইনের কল্যাণে। তাই এই এয়ারলাইনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে খুবই নিবিড় ও আবেগঘন হবে এটাই স্বাভাবিক। এই সংস্থার সঙ্গে প্রচন্ড নাড়ির টান অনুভব করি বলেই এর সম্পর্কে দুটো ভালো কথা শুনলে আবেগে হৃদয়টা উদ্বেলিত হয়। আবার খারাপ কিছু শুনলে হৃদয় ব্যথিত হয়। তবে বহু বছর ধরে বিমান সম্পর্কে আনন্দিত হওয়ার মতো তেমন কোনো সংবাদ শুনিনি। পত্রপত্রিকায়ও অমন

সুসংবাদ প্রকাশিত হয়নি। অথচ দেখুন, আমাদের পরে যাত্রা শুরু করেও ভিয়েতনাম এয়ারলাইন এখন অনেক বড় এক প্রতিষ্ঠান, যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২০%। উদাহরণটা দিলাম এই কারণে যে, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম প্রায় কাছাকাছি সময়ে স্বাধীন হয়েছিল। তখন দুই দেশের আর্থিক অবস্থাও ছিল এক পর্যায়ের। কিন্তু এখন তারা বেশ এগিয়ে রয়েছে, আর আমরা যেই তিমিরে ছিলাম সেখানেই আছি।

পত্রপত্রিকায় বিমান সম্পর্কে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, তার সবই এই সংস্থার জন্য 'খারাপ এবং বদনামের' হলেও কিন্তু অসত্য নয়। অসত্য হলে তো বিমান কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ (বিচ্ছিন্নভাবে দু একটি ছাড়া) করতেন। আর বিমান কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদই করবেন কোন মুখে? সাংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের চাইতে বিমানের আসল অবস্থা যে অনেক অনেক বেশি খারাপ এটা তারা বাইরের সবার চেয়ে বেশি জানেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন এমন দুরবস্থায় পড়ল বিমান? অবশ্যই তা একদিনে হয়নি।

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি একখানা ডাকোটা প্লেন দিয়েই বিমান তার যাত্রীবাহী ফ্লাইট শুরু করেছিল। কিন্তু মাত্র ছয় দিনের মাথায় ১০ ফেব্রুয়ারি ট্রেনিং ফ্লাইট করতে গিয়ে ওই বিমানটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্র্যাশ করে অর্থাৎ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে পাঁচজন পাইলট মারা যান। ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল ক্যাপ্টেন খালেকের 'পাগলামী' বা অদূরদর্শিতার জন্য, কোনো দুর্নীতির কারণে নয়। তবে এর পেছনে খানিকটা ষড়যন্ত্রও ছিল। কারণ ক্যাপ্টেন খালেক কোনো কালে ইনস্ট্রাকটর পাইলট ছিলেন না। ট্রেনিং ফ্লাইট পরিচালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কোনোটাই তাঁর ছিল না। কয়েকজন সিনিয়র পাইলট যারা পাকিস্তানের দালাল বলে চিহ্নিত ছিলেন, তারা খালেক সাহেবকে তোষামোদ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাইলটদের ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের চিফ করে দিলেন। তিনিও ট্রেনিং ফ্লাইট পরিচালনায় নিয়োজিত হলেন। এতে করে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই বীর সেনানী দুর্ঘটনার শিকার হলেন।

ওই দুর্ঘটনার পর বিমান আবার বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। এক এক করে আমাদের ছয়টা ফকার ফ্রেন্ডশিপ-২৭ প্লেন হলো। বোয়িং-৭০৭ বিমানও যোগ হল। ধীরে ধীরে বিমানের অভ্যন্তরীণ রুট ছাড়িয়ে এক সময় আন্তর্জাতিক ফ্লাইটও বাড়তে শুরু করলো। ফলে লাভের মুখ দেখলো বিমান। এজন্য বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন, সততারও পরিচয় দিয়েছেন।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় বিমানে তেমন দুর্নীতির খবর জানা যায়নি। তখন সমস্যা হতো এই কারণে যে, তিনি বড়ো বেশি বেশি বিদেশ সফর করতেন। মোট বোয়িং প্লেন ছিল তিন বা চারটি। সম্ভবত তিনটাই হবে। এর মধ্য থেকে তিনি একটা নিয়ে বিদেশ সফরে যেতেন। তিনি যখন সফরে যেতেন তখন অন্য একটা বিমানকে স্ট্যান্ডবাই বা বিকল্প হিসেবে রাখতে হতো। এ কারণে বিমানের ফ্লাইট

আমরা যখন আলাদা এয়ারলাইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের তৈরি করা নথিপত্র বঙ্গবন্ধুর হাতে দিতে গেলাম তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বরং হাসতে হাসতেই দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, দেশটাই তো আলাদা করে দিচ্ছি! কিসের আবার আলাদা এয়ারলাইন? দেশ স্বাধীন হলে ওটা তো এমনিতেই হবে

শিডিউল রক্ষা করা যেতো না। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তাঁর সময় দুটি এফ-২৮ প্লেন ক্রয়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এতে জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য ওবায়দুর রহমানের কারাদন্ড হয়েছিল। কিন্তু বিমানের অভ্যন্তরের অনেক কথা জানা থাকায় আমি মনে করি, ওই বিমান দুটি ক্রয়ে তেমন দুর্নীতি হয়নি।

বিমানে আসল দুর্নীতি শুরু হয় 'প্রেমিক-প্রেসিডেন্ট' খ্যাত এরশাদের আমলে। আমরা যে আজ পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, এর শুরুটা কিন্তু হয়েছিল ওই সময়ই। পতিত প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময়ে দেশের অন্যান্য সংস্থার লোকদের মতোই বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও দুর্নীতির সংক্রমণ ঘটে। বলা বাহুল্য, দেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী ও আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে তা দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের মতো দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক! তাই স্বীকার করছি, এরশাদ সাহেব শুধু নিজেই দুর্নীতি করেননি, দেশবাসীকে দুর্নীতি করতে শিখিয়েছেন, তাদের মাঝে আমাদের বিমান কর্মচারীরাও বাদ যায়নি।

তবে এরশাদ সাহেব যখন প্রেসিডেন্ট তখন ডিসি-১০ বিমানগুলো কিনে এই সংস্থাকে অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, কথাটা খুবই সত্যি। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ডিসি-১০ বিমানগুলো কেনার ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। যেমন- বিমান কর্তৃপক্ষ যখন সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনের কাছ থেকে প্রতিটা ২৬ মিলিয়ন ডলার দামে ৩টি ডিসি-১০ প্লেন কিনতে যাচ্ছিল তখন ঘটনাক্রমে সে খবরটা পৌঁছে যায় পিআইএ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার জামালের কাছে। তিনি বিমানকে চিঠি দিয়ে জানান, সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন তাদের (পিআইএ) কাছে ওই একই মডেলের প্লেনের প্রতিটি ১৭ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা এতেও রাজি না হয়ে, বরং ১৫ মিলিয়ন ডলার দরে আল ইটালিয়ার কাছ থেকে আরো উন্নতমানের ডিসি-১০ প্লেন কিনেছেন। বিমানে তখনো কিছু সৎ লোক ছিলেন বলে আনোয়ার জামালের চিঠিখানার কপি তাঁরা পত্রিকায় প্রকাশ করে দিলেন। এর ফলে চাপের মুখে পড়ে দর কিছুটা কমিয়ে প্রতিটা ডিসি-১০ বিমান ২৩ মিলিয়ন ডলার দামে কেনা হয়।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ডিসি-১০ বিমান প্রস্তুতকারী ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস কোম্পানি যখন নিলো তারা আর এটি তৈরি করবে না, তখন (যদ্দুর মনে মনে পড়ে) জাম্বিয়া বা আফ্রিকার কোনো একটি দেশ ওই কোম্পানিকে জানালো তাদের ইতিপূর্বে অর্ডার দেয়া ডিসি-১০ প্লেনটি তারা আর নিতে চায় না, বুকিংয়ের সময় দেওয়া অগ্রিম অর্থও তারা আর দাবি করবে না। অথচ বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেবের হুকুমে ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের সর্বশেষ তৈরি করা ডিসি-১০ বিমানটিই সর্বোচ্চ মূল্যে (সম্ভবত ৭৭ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে কেনা হয়। যে প্লেন আর উৎপাদিত হবে না, তা সর্বোচ্চ মূল্যে কেনার পেছনে যে কমিশন খাওয়া বা দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তা কী বলার অপেক্ষা রাখে?

আমি অ্যারোপ্লেনও চালিয়েছি একটানা ৩৮ বছর। ফ্লাইংয়ের অভিজ্ঞতা ২৪ হাজার ঘন্টা। ক্যাপ্টেন হিসেবে ডিসি-১০ প্লেন চালিয়েছি ১৭ বছর। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোনো দেশের অভিজ্ঞতম পাইলটদের সমান অভিজ্ঞতা আছে আমার। আবার বিমানের অভ্যন্তরে সংঘটিত নানা অনিয়ম-দুর্নীতির খবরও জানি।

পাঠকদের এবার আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশেরই অন্যতম বেসরকারি মালিকানার এয়ারলাইনের নাম সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্স। এই এয়ারলাইনের মালিক বিকল্পধারা নামের রাজনৈতিক দলটির এক নেতা ও বিশিষ্ট শিল্পপতি মেজর (অব.) মান্নান বা তাঁর কন্যা। এর সঙ্গে একজন বিদেশী উদ্যোক্তাও আছেন। এই এয়ারলাইন কোনো শিডিউল ফ্লাইট করে না, করে শুধু কার্গো পরিবহনের ফ্লাইট। সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্সের বিদেশী উদ্যোক্তাটি এক সময় ছিলেন ইরানের নাগরিক এবং সেই দেশের এয়ারলাইনের পাইলট। খোমেনীর ধর্মীয় গোঁড়ামি পছন্দ না হওয়ায় দেশ ছেড়ে চলে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমানে তিনি মার্কিন নাগরিক। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি (Taroam) অর্থাৎ রুমানিয়ান এয়ারলাইনের পরিত্যক্ত দুটি অতিশয় পুরনো বোয়িং-৭০৭ উড়োজাহাজ সাত লাখ ডলারে কিনলেন। তারপর দু'খানার সব যন্ত্রপাতি দিয়ে একখানা উড়োজাহাজকে ত্রুটিমুক্তভাবে উড্ডয়নক্ষম করলেন। আরো কিছু অর্থ ব্যয় করে উড়োজাহাজটিকে সম্পূর্ণ কার্গো বহনের উপযোগী করা হলো। বাংলাদেশেই সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্সের রেজিস্ট্রেশন করা হলো। ওদের পাইলট এবং ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারদের ফ্লাইং লাইসেন্সও বাংলাদেশী লাইসেন্সে রূপান্তরিত করা হলো। যেহেতু অ্যারোপ্লেনখানা বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত এবং এর ক্রুদের লাইসেন্সও

বাংলাদেশী, তাই প্লেনখানার রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ক্রুদের দক্ষতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের লাইসেন্স নবায়নের দায়িত্ব আমাদের সিভিল এভিয়েশন বিভাগের। এসব দায়িত্ব পালন করেন সিভিল এভিয়েশন বিভাগের ফ্লাইট ইন্সপেক্টররা। আমাদের সিভিল এভিয়েশন বিভাগের একজন ইন্সপেক্টর আমাকে বলেছিলেন, রুটিন চেকে ওই এয়ারলাইনে ফ্লাইং করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, অতো পুরনো অ্যারোপ্লেনে একটাও যান্ত্রিক ত্রুটি নেই। পাইলট এবং ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত যোগ্যতাও প্রশংসনীয়। ওই এয়ারলাইনের বোয়িং-৭০৭ অ্যারোপ্লেনটি নিয়মিতভাবে কার্গো নিয়ে দুবাই-বেনগাজী-ত্রিপলি রুটে ফ্লাই করে।

সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন যদি অমন পুরনো বোয়িং-৭০৭ প্লেন অতো সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে লাভজনকভাবে চালাতে পারে, তবে আমরা কেন বিশ বছর আগে বিমানের বোয়িং-৭০৭ প্লেনগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলাম? জোর দিয়েই বলছি, বিক্রি করতে হয়েছিল আমাদের 'দুর্নীতির দীক্ষাগুরু' প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলহাজ এরশাদ সাহেবের ইচ্ছায়। ৪টি বোয়িং-৭০৭ যে দামে বিক্রি করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি মূল্যের যন্ত্রাংশ বিনামূল্যে দেওয়া হয় ক্রেতাদের।

ওই সময় বিমানের কর্মকর্তাদের মাঝে দুজন অতিশয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন। এই দু জনের একজন ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবের ভগ্নিপতি। অন্যজন এরশাদ সাহেবের ধর্মপুত্র বলে পরিচিত বিমানেরই এক কর্মকর্তা। এই দুজন কর্মকর্তা বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখতেন। এ নিয়ে বিমানে অনেক কানাঘুষাও ছিল।

এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবের ভগ্নিপতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৬৬-৬৭ সালে। তখন পিআইএ'র বাঙ্গালি কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনি একটু উঁচু পদমর্যাদায় চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত পিআইএ'র বাঙ্গালি কর্মচারীদের অবিসংবাদিত নেতা। ওই সময় তাঁরই সমান পদমর্যাদায় আরো দু'জন বাঙালি কর্মকর্তা করাচিতে পিআইএ'র সদর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ওই দু'জন কর্মকর্তা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতেই যেনো লজ্জাবোধ করতেন! অন্যদিকে 'ভগ্নিপতি সাহেব' কিন্তু গর্বভরেই নিজেকে বাঙালি পরিচয় দিতেন। তাই নিম্নপদস্থ বাঙালি কর্মচারীরা কোনো সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছেই ছুটে যেতেন। আমি একদিন 'ভগ্নিপতি' সাহেবের অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, বাইরে কাঠের ফলকে ইংরেজিতে তাঁর নাম এবং পদমর্যাদা লেখা রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই টেবিলের ওপরে কাঠের ফলকে বাংলা হরফে তাঁর নাম লেখা দেখলাম। এতে তাঁর দুরন্ত সাহসের পরিচয় পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, তাতে আমি অভিভূত না হয়ে পারিনি। আসলে তাঁর ড্রয়ারে একখানা বাংলা হরফে নাম লেখা এবং অন্য একখানা উর্দু হরফে লেখা, এ রকম দুটি কাঠের ফলক ছিল। বাঙালি কর্মচারীরা সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বাংলা হরফে লেখা ফলক টেবিলের ওপর রাখতেন আর ড্রয়ারে রাখতেন উর্দু ফলক। আবার পাকিস্তানিরা আসলে উর্দুতে লেখা ফলকটি টেবিলের ওপর শোভা পেত আর বাংলা লেখা কাঠের ফলকটি থাকত ড্রয়ারে। এ রহস্য অবশ্য খুব বেশি বাঙালি কর্মচারীদের জানা ছিল না। আসলে এটি ছিল পিআইএ ম্যানেজমেন্টের একটি কূটচাল বা কৌশল। তারা 'ভগ্নিপতি' সাহেবের সাহায্যে বাঙালি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করে পিআইএ'র কর্মচারী ইউনিয়নকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতো। এভাবেই ভগ্নিপতি সাহেব এভাবেই পিআইএর দাবার ঘুঁটি হয়ে কাজ করতেন। কিন্তু এমন ধূর্ত-বিপজ্জনক ব্যক্তিটি আবার এরশাদ সাহেবের সময় তার ধর্মপুত্রের দাপটে বেশ নিষ্প্রভ হয়ে ছিলেন। খুব ধূর্ত লোক ছিলেন বলেই ভগ্নিপতি সাহেব জানতেন কখন নিষ্প্রভ থাকতে হবে, আর কখন জ্বলে উঠতে হবে।

এরশাদের ধর্মপুত্রদের কথা

বিমানের পুরনো বোয়িং-৭০৭ প্লেনগুলো বিক্রির দায়িত্বে ছিলেন এরশাদ সাহেবের ওই ধর্মপুত্র। তিনিই যখন বিমানের ক্রয়-বিক্রয় কমিটির প্রধান তখন বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সাক্ষীগোপালের মতো নিষ্ক্রিয় থাকা ছাড়া তো আর কিছুই করার ছিল না। তবে বোয়িং-৭০৭ প্লেনগুলো বিক্রি করে ধর্মপুত্র কিছু পেয়েছিলেন কিনা বা পেলেও কত পেয়েছেন তা জানি না! তিনি যা করেছেন তা কিন্তু এরশাদের নির্দেশে বা তাকে জানিয়েই করেছেন। এমনও হতে পারে, এসব নির্দেশাবলী অবশ্য সঠিক চ্যানেলেই অর্থাৎ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই আসতো। আবার এমনও হতে পারে বোয়িং-৭০৭ প্লেনগুলো বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নতুন বিমান কেনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্যে। কারণ নতুন বিমান কেনার মধ্যেই অর্থপ্রাপ্তির সুযোগও বেশি ছিল। কিন্তু দেশের স্বার্থে এসব পুরনো বিমানকে কার্গো পরিবহনে রূপান্তরিত করেও যাত্রীবহনের জন্যে নতুন বিমান কেনা যেতো। পুরনো বিমান পরিচালনা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন লোকসানের মুখে পড়ে বা ভাগীদার হয়, এমন ধারণা কোনো কোনো অর্থনীতিবিদও পোষণ করে থাকেন! কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা।

যাই হোক, শুধু বোয়িং-৭০৭ বিমানগুলাই নয়, ওই একই সময় বিমানের তখনকার এফ-২৭ প্লেনগুলোও পানির দামে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এখনো ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিমানবন্দরে এফ-২৭ মডেলের প্লেন চলাচল করতে দেখা যায়। আমি গত জুলাই মাসে (২০০৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে কয়েক দিন ছিলাম। তখন আলাস্কা যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, আলাস্কার প্রাণকেন্দ্র ফেয়ার ব্যাংকস্ পর্যন্ত যেতে হলে, অ্যাংকরেজ শহর পর্যন্ত গিয়ে এফ-২৭ প্লেনে ফেয়ার ব্যাংকস গেলে টিকিটের দাম পড়ে অনেক কম। যদিও আমার আলাস্কা যাওয়া হয়নি। তবু আমেরিকায় এখনো যে এফ-২৭ প্লেন যথেষ্ট যাত্রীবহন করে সে বিষয়টার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলাম।

দু'খানা এটিপি বিমান কেনার পথ সুগম করতে বিমানের এফ-২৭ প্লেনগুলোও তাড়াহুড়ো করে খুব সস্তায় বিক্রয় করা হয়েছিল। এটিপি উড়োজাহাজ দুটি ক্রয়ের ব্যাপারে যে অনেক দুর্নীতি হয়েছিল তা তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটিপি উড়োজাহাজ দুটিও কেনা হয়েছিল এরশাদ সরকারের আমলেই। মোদ্দা কথা হলো, বাংলাদেশ বিমান যে আস্তে আস্তে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, সে জন্যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে, অ্যারোপ্লেন কেনা-বেচার মধ্যে বড়ো রকমের দুর্নীতি।

বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামল তখন। আমি বিমানের ফ্লাইট নিয়ে ব্রাসেলস থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলাম। ওই ফ্লাইটে তখনকার সরকারি দলের একজন সাংসদও ছিলেন। যিনি আবার আমার বিশিষ্ট বন্ধুও বটে! তো আমরা যখন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে পাড়ি দিচ্ছিলাম তখন সাংসদ বন্ধুবর ককপিটে এলেন। কথায় কথায় তারই দলের বিমানমন্ত্রীকে নিয়ে জবর এক রসিকতার কথা শোনালেন। তখনকার বিমানমন্ত্রীকে নাকি অন্য এক মন্ত্রী রসিকতা করে বললেন, আরে শোনো, এয়ারবাস প্লেন কিনে বিএনপিঅলারা বিমানের অবস্থা আখের ছোবড়ার মতো করে রেখে গেছে। এখন তুমি ওখান থেকে আর কতোটা ফায়দা লুটতে পারবে জানো? তখনকার বিমানমন্ত্রী নাকি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ছোবড়া থেকেও যদি রস বের করতে না পারবো তবে আর ইঞ্জিনিয়ার হলাম কেনো? ওই মন্ত্রী যখন দেখলেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েও ছোবড়া থেকে তেমন একটা রস বের করতে পারছেন না, তখন এ কাজে তাকে সহযোগিতা করার জন্যে বিমান মন্ত্রণালয়ের সচিব করে আনলেন অন্য আর এক ইঞ্জিনিয়ারকে। দুই ইঞ্জিনিয়ার মিলেও তাদের মনের মতো করে রস বের করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। বিমানের জন্যে তারা দুটো ডিসি-১০ প্লেন তিন বছরের জন্যে লিজ নিয়েছিলেন। অথচ যে পরিমাণ টাকা খরচ করে তারা ওই দুটো উড়োজাহাজ লিজ নিয়েছিলেন, তা দিয়েই বা সঙ্গে আরো সামান্য কিছু অর্থ যোগ করলেই নতুন দুটি ডিসি-১০ কেনা যেতো। এতে বাংলাদেশ বিমানের লাভটা দীর্ঘস্থায়ী হত। দুটো পুরনো ডিসি-১০ লিজ এনে আর কতোটা রস বের করা যায়? নতুন অ্যারোপ্লেন কেনার জন্যে তাঁদের জোর তৎপরতা ছিল। কিন্তু তখনকার প্রধানমন্ত্রীকে বিমানের পাইলট ও ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়াররা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, ডিসি-১০ প্লেনগুলো বিদায় করে নতুন অ্যারোপ্লন কেনার বিলাসিতা দেখানো উচিত হবে না। ডিসি-১০ প্লেনগুলো তখনো যথেষ্ট ভালো সার্ভিস দিতে সক্ষম ছিল এ বিষয়ে যে তখনকার প্রধানমন্ত্রী একমত হয়েছিলেন, এটা তাঁর সততারই প্রমাণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

কোনো কোনো পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন, তবে কী বিমানের জন্য কখনো নতুন অ্যারোপ্লেন কেনা উচিত হবে না? অবশ্যই কেনা উচিত হবে। যখন বিমানের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো হবে তখনই কেনা উচিত, তার আগে নয়।

আমি অ্যারোপ্লেনও চালিয়েছি একটানা ৩৮ বছর। ফ্লাইংয়ের অভিজ্ঞতা ২৪ হাজার ঘন্টা। ক্যাপ্টেন হিসেবে ডিসি-১০ প্লেন চালিয়েছি ১৭ বছর। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোনো দেশের অভিজ্ঞতম পাইলটদের সমান অভিজ্ঞতা আছে আমার। আবার বিমানের অভ্যন্তরে সংঘটিত নানা অনিয়ম-দুর্নীতির খবরও জানি

একটা উদাহরণ দেই। 'ভার্জিন আটলান্টিক' এখন পৃথিবী বিখ্যাত এয়ার লাইনগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু শুরুতে যখন তাদের মূলধন খুব কম ছিল, তখন তারা অতি পুরনো ১০০ সিরিজের বোয়িং-৭৪৭ লিজে নিয়ে যাত্রী পরিবহন শুরু করে। সেই পুরনো হান্ড্রেড সিরিজের লিজ নেয়া বোয়িং-৭৪৭ চালিয়ে তারা যথেষ্ট মুনাফাও অর্জন করে। আর্থিকভাবে যখন সচ্ছল হয়ে ওঠার পরই কেবল 'ভার্জিন আটলান্টিক' বিশাল বিশাল নতুন বা সর্বাধুনিক প্লেন কিনতে শুরু করলো। ভার্জিন আটলান্টিক এয়ারলাইনের সেই পুরনো বোয়িং-৭৪৭ জাহাজের ককপিটে বসে অ্যামস্টারডাম থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন দেখেছি, সেই পুরনো উড়োজাহাজে সামান্যতম যান্ত্রিক ত্রুটিও ছিল না। অথচ কিছু দিন আগে অনেক যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার জন্য বিমানের একখানা ডিসি-১০ প্লেনকে আমেরিকার ফেডারেল এভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) দুদিনের বেশি সময়ের জন্যে নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে আটকে রেখেছিল। এফএএ-র কর্মকর্তাদের বক্তব্য হলো, আমেরিকার আকাশপথে যান্ত্রিক ত্রুটিযুক্ত অ্যারোপ্লেন চালানো যাবে না। তাদের আকাশপথকে বিপজ্জনক করা যাবে না। এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার জানা যায়, উড়োজাহাজ পুরনো না নতুন তার চেয়ে বড়ো কথা হলো ওগুলোর মেইন্টেন্যান্স করা হচ্ছে কেমন? পুরনো অ্যারোপ্লেন ঠিকঠাক মতো ত্রুটিবিচ্যুতিহীনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার খরচ নতুন অ্যারোপ্লেনের চাইতে অবশ্যই অনেক বেশি। তবে এই মুহূর্তে আমাদের বিকল্প তেমন নেই। আর যদি নতুন অ্যারোপ্লেন কিনতেই হয়, তবে অবশ্যই সেটা হতে হবে বিমানের স্বার্থে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ মহলের লাভবান হওয়ার জন্য নয়। এছাড়া পুরনো সব এরোপ্লেনসহ বিমানকে বেসরকারি খাতের কোনো সুখ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যারা লাভজনকভাবে তা পরিচালনা করতে পারবে।

দীর্ঘদিন ধরে বিমান চালনার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, যাত্রী হিসেবে আমাদের বাংলাদেশীরা কিন্তু অত্যাধুনিক অ্যারোপ্লেন, খুব আরামদায়ক আসন, বিলাসী খানা-পিনা, প্রত্যেক আসনের সামনে টেলিভিশন স্ক্রিন এসব চান না। তাঁরা চান বাংলাদেশ বিমান সময়মতো ছাড়বে, নিরাপদে চলাচল করবে এবং গন্তব্যে পৌঁছাবে (অর্থাৎ যখন তখন যেখানে সেখানে মুখ থুবড়ে পড়বে না)।

আমরা বিপদে পড়লে বা ভয় পেলে যথেষ্ট দোয়া-কালাম পড়ি এবং অনেক সময় তা পড়ে নিজ নিজ বুকে ফুঁ দিয়ে থাকি। বাংলাদেশ বিমানে চড়লে যাত্রার প্রাক্কালে সহযাত্রীদের যেভাবে দোয়া-দরুদ পড়তে দেখি তাতে মাঝেমধ্যে ভয় পেয়ে যাই।

এখন থেকে ৬ কি ৭ বছর আগের কথা। ব্রাসেলস্ থেকে আমি ঢাকায় ফ্লাইট নিয়ে আসবো। একটি ইঞ্জিনে কিছু সমস্যা দেখা দেয়ায় ২৪ ঘণ্টারও কিছু বেশি সময়ের জন্যে ফ্লাইটটি ব্রাসেলসে বিলম্বিত হলো। তারপর ওখান থেকে ছেড়ে এসে খুব ঘন কুয়াশার কারণে দিল্লিতে অবতরণ করতে পারলাম না। চলে গেলাম দিল্লির বিকল্প বিমানবন্দর মুম্বাইতে। পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা পর দিল্লি ফিরে এসে ওখানকার যাত্রী নামানো-ওঠানো হলো। ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করতে যাবো ঠিক তখনই আবার দেখা দিলো যান্ত্রিক সমস্যা। আমরা ক্রুরা এবং যাত্রীরাও চলে গেলাম দিল্লির এক হোটেলে। রাত কাটাতে হলো ওখানেই। পরের দিন ঢাকা থেকে যন্ত্রাংশ পাঠানো হলো এবং আমাদের প্লেনের যান্ত্রিক সমস্যা সারানো হল। অবশেষে ব্রাসেলস্ থেকে ঢাকা আসতে আমাদের সাড়ে তিন দিন লাগল।

ব্রাসেলস্-ঢাকা রুটের সেই ফ্লাইটটি অমন বিশ্রীভাবে বারবার বিলম্বিত হওয়ায় যাত্রীরা বিমানের ম্যানেজমেন্ট এবং ব্রাসেলস ও দিল্লির বিমান স্টাফদের খুব গালমন্দ করেছেন। কিন্তু যাত্রীরা কোনো ক্রুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। বরং দু'একজন যাত্রী কোনো ক্রুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে উদ্যত হতেই অন্যযাত্রীরা ক্ষুব্ধ যাত্রীদের বুঝিয়েছেন, 'ক্রুদের কী দোষ'? তারা তো আমাদের সঙ্গে থেকে একই সঙ্গে কষ্ট করছেন। তিন থেকে চারদিন এক সঙ্গে থাকার ফলে বেশ কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। দিল্লি থেকে ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার আগে প্লেনের সম্মুখভাগের এক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তিনি জানান, তিনি থাকেন আমেরিকার নিউজার্সিতে। বোনের বিয়ের বাজার করে ঢাকায় যাচ্ছেন। দিল্লি থেকে সকাল বেলায় ঢাকায় কথা বলে জেনেছেন, একদিন আগেই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সময়মতো বিয়ের বাজারও পৌঁছে দিতে পারলেন না এবং বিয়ের অনুষ্ঠানেও থাকতে পারলে না। আমি তাকে বললাম, আপনি তো বিয়ের অনুষ্ঠান মিস্ করেছেন? যাত্রীদের মাঝে এমন কেউ কেউ থাকতে পারেন, যারা বাবা-মায়ের গুরুতর অসুস্থতার খবর শুনে ঢাকায় আসছেন। এমনও হতে পারে ফ্লাইট বিলম্বের কারণে তারা বাবা বা মাকে জীবিত অবস্থায় হয়তো আর শেষ দেখাটাও দেখতে পারলেন না।

ওই ঘটনার কয়েক মাস পর আমি নিউইয়র্ক থেকে ব্রাসেলস্ পর্যন্ত ফ্লাইট নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই ফ্লাইটে ব্রাসেলস-ঢাকার ওই বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত ফ্লাইটের এক যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। প্লেনের এক্সিকিউটিভ শ্রেণীতেই তিনি ভ্রমণ করছিলেন। যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষ। যেকোনো এয়ার লাইনের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার সামর্থ্য তার আছে। বেগম সুফিয়া কামালের ভ্রাতুষ্পুত্র বা অমনই এক নিকটাত্মীয় তিনি। ভদ্রলোককে সেই বিড়ম্বনাময় ফ্লাইটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললাম, আবারো বিমানেই ভ্রমণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, কী আর করবো? বাংলাদেশের অবস্থাও তো বিমানের মতোই বিপর্যস্ত! তারপরেও তো ফিরে ফিরে বাংলাদেশে আসছি! এটা তো প্রাণের টান! বুঝলাম, বাংলাদেশের প্রতি যেমন, তেমনই বাংলাদেশ বিমানের প্রতিও তাঁর প্রাণের টান রয়েছে। যে বিমানের শিডিউল অনুযায়ী সময়মতো ছাড়া বা পৌঁছানোর কোনো বালাই নেই, তারপরও শুধু প্রাণের টানেই প্রবাসী বাঙালিদের অনেকেই তাতেই চলাচল করে থাকেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশ বিমান আমাদের দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিদের এই 'প্রাণের টান'-এর প্রতিদান দিতে বা মূল্যায়ন করতে পারেনি, লাভজনক প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হতে পারেনি। আমি মনে করি, তিনটি কারণেই তা হয়নি। কারণগুলো হচ্ছে, ১. দুর্নীতি ২. বিমান কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা ৩. সরকারের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ বিমানে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হয় উড়োজাহাজের ক্রয়-বিক্রয়, লিজ গ্রহণ এবং যন্ত্রাংশ কেনার ক্ষেত্রে। কারণ বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য দেখিয়ে এসব করা যায়। যা এক কথায় 'অকল্পনীয়'। উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তিতেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়। এভাবে লাগামহীন দুর্নীতির কারণে বিমানের ব্যয়ভারও দ্বিগুণ বা তারও বেশি হয়ে যায়। এই অবস্থায় লাভটা আসবে কোত্থেকে?

অ্যারোপ্লেন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে কিছুটা দুর্নীতি হয়েছিল। সেটা মস্তবড়ো অংকের দুর্নীতি না হলেও একটু লিখছি। '৭৫ সালের আগস্ট মাসে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানির পরামর্শে পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া এক গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাওয়াবকে জার্মানির শ্বশুরবাড়ি থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান করে আনা হলো। তাকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদ মর্যাদায় বিমানবাহিনী প্রধানের পাশাপাশি উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং বিমান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টাও করা হয়। বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই পাকিস্তানপন্থী ওই গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্যান এয়ার নামের এক আমেরিকান কোম্পানির কাছ থেকে অতিপুরাতন এবং অব্যবহৃত একখানা বোয়িং-৭০৭ প্লেন কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিমান কর্তৃপক্ষ ওই প্লেন কেনার বিপক্ষে মতামত দিলেন। কিন্তু বিমান

বাহিনীর প্রধান, উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিমান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে ওই প্লেন কেনার জন্যে তিনি সরাসরি নির্দেশই দিয়ে দিলেন। ফলে বিমানকে বাধ্য হয়েই ২৪ লাখ ৭০ হাজার ডলার মূল্যে প্লেনটা কেনা হলো। নগদে এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ ডলার শোধ করা হলো। ক্রয় চুক্তিতে বাকি অর্থ ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্ত ছিল। তা পূরণে ব্যর্থ হলে ওই অ্যারোপ্লেনের ওপর বিমানের আর কোনো দাবি থাকবে না এবং যে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে সেটাও ফেরত পাওয়া যাবে না!

বলে রাখা ভালো, প্যান এয়ার ওই প্লেনটাই পিআইএ'র কাছে প্রায় অর্ধেক দামে অর্থাৎ ১৫ লাখ ডলারে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু প্লেনটার অবস্থা মূল্যায়ন করে পিআইএ তাতেও রাজি হয়নি। এরপর এক বছর প্লেনটা গ্রাউন্ডেড অবস্থায় থাকার পর প্রায় দ্বিগুণ দামেই বাংলাদেশ বিমানকে সেটি কিনতে বাধ্য করেন তাওয়াব সাহেব। মনে রাখতে হবে, ১৯৭৫ সালের ২৪ লাখ ৭০ হাজার ডলার এখনকার মূল্যমানে অনেক বড় অংকের অর্থ।

যাই হোক, প্যান এয়ারের কাছ থেকে ক্রয় করে ওই প্লেনটা কোনো প্রকারে ফেরি ফ্লাইট করেই ঢাকায় আনা হলো। বাংলাদেশে প্লেনটার রেজিস্ট্রেশন হলো 'এস টু আলফা আলফা লিমা' (S2-AAL) হিসেবে। কিন্তু প্লেনটা যাত্রী নিয়ে ফ্লাই করার জন্যে সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল না। তাই সেটাকে নিরাপদে যাত্রী পরিবহনের উপযোগী করে তোলার জন্যে আবার ফেরি ফ্লাইট করেই লন্ডনের কাছে স্ট্যান্ডস্টেড বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভালোভাবে মেরামত করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ খরচ করার সামর্থ্য তখন বিমানের ছিল না। এমন কি বিমান প্যান এয়ারের পাওনা বাকি অর্থও ত্রিশ দিনের সময়সীমার মধ্যে শোধ করতে পারলো না। ফলে প্যান এয়ার শর্ত মোতাবেক আলফা আলফা লিমা প্লেনখানা তারা আটকে দিল। অনেক দেন দরবার করা হলো এক মিলিয়ন ডলার ফেরত পাওয়ার জন্যে। প্যান এয়ার জানালো, তারা এক মিলিয়ন নয়, আধা মিলিয়ন ডলার পেয়েছে মাত্র। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গরিব দেশ বিবেচনা করে প্যান এয়ার উদারতা দেখিয়ে ওই টাকাটা ফেরত দিলো। প্রশ্ন হল, বাকি ৫ লাখ ডলার কোথায় গেল? এটা নিশ্চয়ই এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব সাহেবের পকেটে গিয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। বিমানের ফ্লাইট অপারেশন বিভাগের প্রধানের কাছে প্রতিরক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক উচ্চপদস্থ অফিসার একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ একথা সে কথা বলার পর তিনি প্রস্তাবটি পেশ করে বললেন, বিমানের ডিসি-১০ প্লেনগুলোতে যেসব আইএনএস নেভিগেশন যন্ত্র আছে, ওগুলো তো বেশ পুরনো মডেলের। তিনি অর্ধেক মূল্যে সর্বশেষ মডেলের আইএনএস দিয়ে পুরনো যন্ত্রগুলো পরিবর্তন বা রিপ্লেস বা প্রতিস্থাপন করে দিতে পারেন। এতে করে বিমানের অনেক লাভ হবে। তিনি যুক্তি দেখালেন, এতে বিশেষ করে বিমানের ডিসি-১০ প্লেনগুলোর জন্যে নিরাপদে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে সহায়ক হবে। জ্বালানি সাশ্রয়ও হবে যথেষ্ট। বিমানের তখনকার চারখানা ডিসি-১০ প্লেনে মোট ১২টা আইএনএস যন্ত্র ব্যবহার করা হতো, যার মোট মূল্য ছিল প্রায় ২০ কোটি টাকা। তিনি মাত্র দশ কোটি টাকায় ওই প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে দিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, আইএনএস প্রযুক্তি অ্যারোপ্লেনে সংযোজিত হয়েছিল আশির দশকের শুরুতে। তখন এটাকে বিবেচনা করা হতো বিস্ময়কর এক প্রযুক্তি বলে। কিন্তু আইএনএসের চাইতেও অনেক উন্নতমানের নেভিগেশন প্রযুক্তি হলো জিপিএস (গ্লোবাল পজিশন সিস্টেম)। এই জিপিএস ব্যবস্থা অ্যারোপ্লেনে সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯৩ সালের দিকে।

স্নায়ুযুদ্ধ তথা কোল্ড ওয়ার চলার সময় অন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশই মহাকাশে অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছিল। ওই উপগ্রহগুলো থেকে পাঠানো সিগন্যাল দিয়ে জিপিএস যন্ত্রগুলো বানানো হয়। স্নায়ুযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেলো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিকে বেসামরিক কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিলো। দুটি দেশই ঘোষণা দিলো যে কেউ বিনামূল্যে উপগ্রহগুলোর সিগন্যাল ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে আইএনএস-এর মতো ব্যয়বহুল প্রযুক্তির পরিবর্তে তার চাইতে অনেক বেশি নির্ভুল এবং নির্ভরশীল জিপিএস ব্যবস্থা এয়ারলাইনসমূহ ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে নতুন করে আর কোনো এয়ারলাইন আইএনএস যন্ত্র তাদের প্লেনে সংযোজন করলো না। জিপিএস ব্যবস্থা সংযোজনের খরচ আইএনএসের এক দশমাংশের চেয়েও কম। এই অবস্থায় বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত আইএনএস যন্ত্রগুলো উদ্বৃত্ত হয়ে পড়লো। অথচ ওই উদ্বৃত্ত আইএনএস যন্ত্রগুলোই অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বিমানকে গছিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন!

প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার প্রস্তাবে বিমানের ফ্লাইট অপারেশন বিভাগের প্রধান সম্মত হলেন না। বরং বুঝিয়ে বললেন, বিমানের প্রয়োজন জিপিএস দিয়ে আইএনএসগুলোই রিপ্লেস বা প্রতিস্থাপন করা। তাছাড়া ডিসি-১০ প্লেনে ব্যবহার করা আইএনএসগুলো খুবই ভালো কাছ করছে।

এমন জবাব শুনে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বললেন, জিপিএস সম্পর্কে তাঁর খুব ভালো ধারণা আছে। ওগুলো খুবই সস্তা প্রযুক্তি। বিদেশে সাধারণমানের গাড়িতেও ওই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার এতটুকু ধারণা ছিল না, জিপিএস ব্যবস্থা কেমন নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও কেমন কাজ করে এবং গাড়িতে ব্যবহার করা আর অ্যারোপ্লেনের জিপিএস ব্যবস্থার মধ্যেও পার্থক্য কী এবং কতোটুকু?

একজন মুদি দোকানদার যদি একজন জেনারেলকে যুদ্ধবিদ্যা বোঝাতে চেষ্টা করে তবে ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর হবে, তেমনি হাস্যকরভাবে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা অপারেশন বিভাগের প্রধানের মতো একজন অভিজ্ঞতম পাইলটকে অ্যারোপ্লেনের নেভিগেশন সিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান দিতে গেলেন। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাটি এর পর বললেন, আপনাদের মন্ত্রীমহোদয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইএনএস প্রতিস্থাপনে রাজি হয়েছেন, কিন্তু বলেছেন, আপনার সম্মতির প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও ফ্লাইট অপারেশন বিভাগের প্রধান রাজি হলেন না, শুধু আপ্যায়ন করেই উচ্চপদস্থ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাকে বিদায় করেছিলেন।

আমি মনে করি, ওই ফ্লাইট অপারেশন বিভাগের প্রধান ব্যক্তিগতভাবে নির্লোভ ছিলেন। সেজন্য তাকে আইএনএস প্রতিস্থাপনের প্রস্তাবে রাজি করিয়ে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিমানকে গছিয়ে দেওয়া যায়নি। তবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত ওই কর্মকর্তা অবশ্য শেষ সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হননি। কায়দা কানুন করে তিনি উদ্দেশ হাসিলে সক্ষম হন। ফলে কয়েকশ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ কেনা হয়, যা বিমানের স্টোরে পড়ে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত ওই প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার মতো আরো অনেকেই আছেন যারা এভাবে ফায়দা লুটে নেন।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখেছি, বিমানের কাছে জ্বালানি তেলের মূল্য বাবদ ৫০০ কোটি টাকা পাবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। সুদসহ যা ৮০০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। এসব বকেয়া টাকা পরিশোধ না করলে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিমানকে আর জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে না বলে হুমকি দেয়। মজার ব্যাপার হলো, বিমানের স্টোরে এর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের যন্ত্রাংশ অব্যবহৃত পড়ে আছে। যে সংস্থার স্টোরে শত শত কোটি টাকার যন্ত্রাংশ পড়ে থাকে সেটি জ্বালানি তেল কিনে ৮০০ কোটি টাকা দেনা থাকবে কেন? বাড়তি যন্ত্রাংশের বিশাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, প্রায়ই অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ জরুরি ভিত্তিতে সংগ্রহ করার জন্য বিমান পৃথিবীর সর্বত্র তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আরেকটা বিষয়, ডিসি-১০ প্লেনগুলো 'লক্কড়-ঝক্কড়' নাম দিয়ে যখন বিক্রি করা হবে তখন ওই যন্ত্রাংশগুলোও হয়তো বিনামূল্যেই প্লেনের ক্রেতাদের দিয়ে দেয়া হবে। এতে হয়ত অবৈধ লেনদেনও হবে।

বিমান কর্তৃপক্ষ যখন প্লেনের যন্ত্রাংশ ক্রয় করে তখন কোন যন্ত্রাংশের বেশি প্রয়োজন, কোন যন্ত্রাংশ নিয়মিত এবং ঘন ঘন বদলাতে হয় সেসব একদম বিবেচনা করে না, বরং সব যন্ত্রাংশই ক্রয় করে। এর মধ্যে প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক বেশি মূল্যের যন্ত্রাংশগুলোই অধিক পরিমাণে কেনার প্রবণতাই নাকি বিমান কর্তৃপক্ষের বেশি, এমনই অভিযোগ প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায়। এ কারণেই বিমান স্টোরসে যন্ত্রাংশের এমন পাহাড় জমেছে।

বিমানের বর্তমান বেহাল অবস্থা

বেশ কয়েকদিন আগে বিমানের ফ্লাইট অপারেশন বিভাগে টেলিফোন করে জানতে

চাইলাম, বিমানের লন্ডন ফ্লাইট কখন ঢাকা পৌঁছাবে? কারণ ওই ফ্লাইটে আমার একজন আত্মীয় আসবেন। ফ্লাইট অপারেশন বিভাগের ডিউটি অফিসার জানালেন, ওই ফ্লাইট তো ঢাকা থেকেই ছেড়ে যায়নি! ফ্লাইটের সব শিডিউল ওলট-পালট হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটা ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

ডিউটি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন বিপর্যয়কর অবস্থা হয়েছে কেন? বললেন, ৬টি ডিসি-১০ প্লেনের মধ্যে এই মুহূর্তে কেবল দুটি উড্ডয়নক্ষম আছে। একখানা তো কয়েক মাস আগে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করতে গিয়ে ক্র্যাশ করে ফ্লাইংয়ের জন্য চিরতরে অনুপযোগী হয়ে গেছে। একটির ইঞ্জিন বদলাতে হবে বলে দীর্ঘদিন যাবৎ হ্যাঙ্গারে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য একটা..... ইত্যাদি ইত্যাদি। বললাম, এতো কথা টেলিফোনে বলবেন না। কেউ আবার শুনতে পেলে আপনার হয়তো চাকরিই থাকবে না!

প্লেনের অভাবে বিমানের ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে, বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট আপকালীন সময়ের জন্যও বন্ধ করা হচ্ছে, বিমান শিডিউল সব উল্টা-পাল্টা হচ্ছে। এসবের পেছনে আমার মনে হয়, স্বার্থান্বেষী কোনো প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী মহলের হাত আছে। বর্তমানের 'লক্কড়-ঝক্কড়' পুরনো প্লেনের কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রমাণ করে নতুন প্লেন কেনার যুক্তিকে জোরালো করার জন্যই এমনটা করা হচ্ছে বলে আমি ব্যতিগতভাবে মনে করি। অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হয়তো নতুন প্লেন কেনার অর্থ অনুমোদন করছেন না, তাই তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বারবার সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। যাতে তারা বাধ্য হয়ে অনুমোদন দেন। তা না হলে কয়েক মাস আগে একটা প্লেন ক্র্যাশ করার পর ওটার বদলে অন্য একটা ডিসি-১০ প্লেন লিজে আনা যেতো। আর তা পাওয়া না গেলে অন্য যেকোনো প্লেন ক্রুসহ চার্টার করে আনা যেতো! একটা ইঞ্জিনের জন্য একখানা ডিসি-১০ প্লেন মাসের পর মাস হ্যাঙ্গারে পড়ে থাকতো না। নতুন প্লেন কেনার ব্যাপারে আগ্রহীরাই মূলত বিমানের শিডিউল বিপর্যয়ে বেশি খুশি।

গত ২০০৫ সালের ২৯ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'বিশ্বাস হয় না বিমান শেয়ার বিক্রি করবে' শীর্ষক একটা নিবন্ধ লিখেছেন দেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ। তিনি পুরনো উড়োজাহাজের প্রসঙ্গ ছাড়া তাঁর লেখা নিবন্ধের সব কথাই সত্যি। তাঁর ধারণা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ক্রমশ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে কেবল পুরনো উড়োজাহাজের কারণে। এ ব্যাপারে পুরনো অ্যারোপ্লেন সম্পর্কে আমি বিস্তারিত করেই লিখেছি। আবু আহমেদ সাহেবকে একটা তথ্য জানাতে চাই যে, যখন আমরা আমাদের বোয়িং-৭০৭ অ্যারোপ্লেনগুলো বিক্রি করে দেই, তখনো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পুরনো বোয়িং-৭০৭ প্লেনেই চড়তেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বহনকারী প্লেনের কলসাইন 'এয়ারফোর্স ওয়ান'। গত বছর জুলাই মাসে আমেরিকার সিয়াটল শহরে গিয়ে ওখানকার বিখ্যাত জাদুঘর 'মিউজিয়াম অব ফ্লাইট'-এ দু'দিন গিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হবার আগে যে বোয়িং-৭০৭ প্লেনে ডালাস গিয়েছিলেন, ওই প্লেনখানা সিয়াটলের মিউজিয়ামে আছে। দর্শকদের জন্য ওই প্লেন ঘুরে ফিরে ভেতর এবং বাইরে থেকে দেখার জন্য উন্মুক্ত। ওই প্লেনের সবকিছু দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বিস্তারিত আর লিখলাম না।

বিমান সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানায় থাকায় বিমান মন্ত্রণালয় কীভাবে বিমানের অর্থের অপচয় ঘটায় তার ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি : আট থেকে দশ বছর আগে আমি বিমানের একটি ফ্লাইট নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাচ্ছিলাম। এক সময় ককপিট থেকে উঠে কেবিনে গেলাম। বিমান মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এক্সিকিউটিভ শ্রেণীতে একটি আসন নিয়ে বসেছিলেন। চিফ পার্সার আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের পাশের আসনে কিছু সময়ের জন্য বসলাম। বললেন, বিমানে একই যাত্রাপথে একই দূরত্বের ফ্লাইটে জ্বালানি তেলের খরচের এমন তারতম্য কেন হয়, এই বিষয়টি তদন্ত করতে তিনি আমাদের ফ্লাইটে টোকিও পর্যন্ত যাচ্ছেন। বিমান মন্ত্রণালয়ই এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে তদন্তভারের দায়িত্ব তাঁর ওপরে চাপিয়ে টোকিও পাঠাচ্ছে তাঁকে। ওখানে সাত দিন থেকে আমাদের সঙ্গেই আবার ঢাকায় ফিরবেন বলে জানালেন।

মন্ত্রণালয়ের ওই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কথা শুনে আমি খুবই কৌতুকবোধ করলাম। প্রশ্ন করলাম, তা কেবিনে বসে বিয়ার পান করতে করতে কী কী তদন্ত করলেন? ককপিটে তো আপনাকে যেতে কেউ অনুমতি দেবে না। তা কেবিনে বসে বিমানবালাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, একবার কম আবার বেশি জ্বালানি তেল খরচ হয় কেন? তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, ঢাকায় বসে এ বিষয়ে বিমানের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠাতে পারতেন! বিমানের টেকনিক্যাল বিভাগে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে অবশ্যই বাধ্য ছিল। তাকে এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করলাম না। তবে পাঠকদের অবগতির জন্য বলছি, একই দূরত্বের জন্য উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল খরচের পরিমাণে কম-বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে : জাহাজের ওজন বেশি হলে, নিচের উচ্চতা দিয়ে ফ্লাই করতে বাধ্য হলে, আকাশপথের আবহাওয়া খারাপ হলে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর অবতরণ করতে দেরি হলে প্লেনের তেল খরচ বেশি হয়।

এসব কথা না বলে মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, বিমানের খরচে বিদেশ ভ্রমণের ভালোই তো একটা ট্রিপ বানালেন! এরপর একই রকমের তদন্তের নামে আর কোন কোন দেশ ভ্রমণের ইচ্ছে আছে?

অতি প্রয়োজনীয় এবং জরুরি কাজে বিমান কর্মকর্তাদের বিদেশে যেতে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়। ওইসব অনুমোদন আটকে রেখে মন্ত্রণালয় থেকে বিমানের কাছে বারবার জানতে চাওয়া হয় বিমান কর্মকর্তাদের ভ্রমণ এত জরুরি কেন। এই অনুমোদন প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কারণ মন্ত্রণালয়ের লোকেরা চেষ্টা করে দেখেন, তাদেরও দু-একজন বিমান কর্মকর্তাদের সফরসঙ্গী হতে পারেন কি না?

পত্র-পত্রিকায় কয়েক মাস আগে দেখলাম, বিমান প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ইয়াঙ্গুন- এই তিনটি গন্তব্যে সাময়িকভাবে ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে। এই সাময়িক বন্ধের প্রভাব কতোটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

এখন থেকে দশ বছর আগে বিমান এথেন্স ফ্লাইট অপারেট করতো। তা ১৯৭৮ সালে শুরু হয়েছিল আর বন্ধ হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিমানবন্দরে একখানা ডিসি-১০ প্লেন ল্যান্ড করার পর দুর্ঘটনায় পড়লে এটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্লেনখানা সারাতে ৬-৭ মাস সময় লেগেছিল। ওই সময় সাময়িকভাবে এথেন্স ফ্লাইট বন্ধ রাখা হয়েছিল। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ফ্লাইট চলাকালে এথেন্সের জন্য বহুসংখ্যক যাত্রী পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ৬-৭ মাস বন্ধ রেখে আবার ফ্লাইটটি চালু করা হলে আগের মতো আর যাত্রী পাওয়া গেলো না। ওই বন্ধের সময়কালে মুম্বাই ও এথেন্সের ট্রাভেল এজেন্সিগুলো অন্য এয়ারলাইনসের যাত্রী পাঠাতে চুক্তিবদ্ধ হয়। বিমান আর ওইসব ট্রাভেল এজেন্সিকে বিমানে যাত্রী পাঠাতে সম্মত করাতে পারেনি। পুনর্বার এথেন্স ফ্লাইট চালু করার পর প্রায় যাত্রীবিহীন অবস্থায় ৪-৫ মাস তা চালু রাখা হয়েছিল। এরপর ফ্লাইট স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় বিমান কর্তৃপক্ষ।

প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ইয়াঙ্গুন ফ্লাইট সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে, খুব সম্ভবত এর পরিণতিও এথেন্স ফ্লাইটের মতোই হবে। ইউরোপের কোনো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে ফ্লাইট চালু

ওই সময় বিমানের কর্মকর্তাদের মাঝে দুজন অতিশয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন। এই দু জনের একজন ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবের ভগ্নিপতি। অন্যজন এরশাদ সাহেবের ধর্মপুত্র বলে পরিচিত বিমানেরই এক কর্মকর্তা। এই দুজন কর্মকর্তা বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখতেন। এ নিয়ে বিমানে অনেক কানাঘুষাও ছিল

করা যে কতো কঠিন তা আমি লিখে বোঝাতে পারবো না। বিমানের প্যারিসসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ফ্লাইট শুরু করার সময় বিমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন মান্নান সাহেব। খালেদা জিয়ার প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে তিনি বিমানের মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিএনপি দলীয় এমপি। বিমানের নিউইয়র্ক ফ্লাইটও চালু করেছিলেন তিনি। মাননীয় সংসদ সদস্য মান্নান সাহেবকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে, নতুন একটা গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে ফ্লাইট চালু করা কতোটা ব্যয়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার?

কয়েক মাস আগের কথা। বিমানের বলাকা অফিসে গেলাম একটা কাজের জন্য। তখন বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন প্রতিমন্ত্রী মীর নাসির সাহেব। চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় বিমানের একজন কর্মচারী তখন বিমর্ষভাবে জানালেন, মীর নাসিরের পরাজয়ে তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছেন। তিনি নিয়ত করেছিলেন, 'মন্ত্রীমহোদয় জয়ী হলে তিনি নফল রোজা রাখবেন।' কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তিনি জয়ী হতে পারলেন না। মনে করেছিলাম, বিমানের ওই কর্মচারী বুঝি মীর সাহেবের একান্ত ভক্ত। এহেন ভক্তির কারণ জিজ্ঞেস করায় উক্ত বিমান কর্মচারী উত্তর দিলেন- 'মীর সাহেব চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচিত হলে, বিমান তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাবে এমনটাই ভেবেছিলাম।' বিমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মচারী এমনই মনে করত বলে আমরা ধারণা। কারণ তার সময়ে বিমানের দুরবস্থার জন্য বিমান কর্মচারীরা কিন্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্নেল মাহমুদুর রহমানকে দায়ী মনে করতেন না। বরং দায়ী মনে করতেন মীর নাসির সাহেবকে।

কর্নেল মাহমুদুর রহমান আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন। তবে তাকে অনেক দিন যাবৎ জানি। ২৩ থেকে ২৪ বছর যাবৎ ছিলেন বিমানের পরিচালকের পদমর্যাদায়। তিনি বহুবার ভারপ্রাপ্ত এমডি হয়েছেন। তিনি সেনাবাহিনীর একজন দক্ষ অফিসার ছিলেন। জিয়াউর রহমানের চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে এরশাদ সাহেব তাকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দিয়েছিলেন।

একইভাবে মান্নান সাহেব যিনি এক সময় বিমানের এমডি এবং পরবর্তীতে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পেশায় একজন অ্যাকাউনট্যান্ট। খুব সুনামের সঙ্গে যিনি বিমান পরিচালনা করেছিলেন। তাকে খালেদা জিয়ার প্রথম দফা প্রধানমন্ত্রিত্বকালের শেষের দিকে কেন বিমানের মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছিল? বর্তমান দফায়ই বা কেন তাকে মন্ত্রী করা হয়নি বা হচ্ছে না? একই উত্তর, 'বন্ধু ন পুঁছো মুজকো ইনকো ইতিহাস'। আমরা যারা বিমানকে ভালোবাসি, এগুলো হলো তাদেরই ক্ষুব্ধ প্রশ্ন!

বিমানের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রকৌশল বিভাগের প্রকৌশলীদের উপেক্ষা করাটাও যথেষ্ট দায়ী। অস্ট্রেলীয় সরকার নিজেদের খরচে বেশ কিছুসংখ্যক বিমানের ইঞ্জিনিয়ারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা ২০-২২ জন খুব মেধাবী ছাত্রকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হয়েছিল। ওই দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা ইঞ্জিনিয়াররা বিমানের প্লেনগুলোকে খুবই দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। কিন্তু বিমানের বেতন কাঠামোতে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা কেন দেশে পড়ে থাকবেন? শুধু দেশপ্রেমের কথায় তো চিঁড়ে ভিজে না! হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে বিমানের ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো টেকনিক্যাল ভাতা দেয়া হয়। কিন্তু বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য তা যথেষ্ট নয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের এয়ারলাইনগুলো অনেক গুণ বেশি মাইনে দিয়ে আমাদের ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গেছে। ভালো ভালো প্রকৌশলীদের বিমানের বেতন কাঠামোর মধ্যে বেতন-ভাতা বাড়াবার আর হয়তো তেমন সুযোগ নেই। কিন্তু কম বেতনের ব্যাপারটাও পুষিয়ে দেয়া যেতে পারে ২৫-৩০ বছর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হলে রাজউক থেকে খুব সুন্দর একটা আবাসিক প্লট পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে। আমার এ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ রসিকতা মনে হতে পারে। কিন্তু সুবিধা না দিয়ে তো আর প্রকৌশলীদের বিদেশে চলে যাওয়া ঠেকানো যাবে না।

আমাদের দেশের সরকারি ব্যাংকগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেক কম বেতন দিচ্ছে। আবার লোকসানও দিচ্ছে। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যাংকগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেক বেশি বেতন-ভাতা দিয়েও প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। বিমানকে লাভজনক করতে হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে তাদের জবাবদিহিতার প্রতিও কড়াকড়ি ব্যবস্থার বিধান করতে হবে। কারণ 'পেটে খেলে পিঠে সয়।'

দক্ষ প্রকৌশলীদের মতো এখন আবার বিমানের পাইলটরাও মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইনগুলোতে চাকরি নিয়ে যেতে শুরু করেছেন। এবার অবশ্য বলা যাবে না বিমানের পাইলটরা যথেষ্ট বেতন পান না। হ্যাঁ, বিমানের পাইলটরা তুলনামূলকভাবে ভালো বেতনই পেয়ে থাকেন। কিন্তু বিমানের বর্তমান দুরবস্থা দেখে পাইলটরা নিজেদের ভবিষ্যৎ-ক্যারিয়ার সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বলেই বিদেশী এয়ারলাইনে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন।

বিমানের অনেক সমস্যার মধ্যে একটা বড় সমস্যা হলো, শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই বেশ ধূর্ত কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষিত এবং সৎ নন। তারা বাইরে কেমন হামবড়া ভাব দেখান, ভেতরটা কিন্তু সে তুলনায় অনেক ফাঁপা। কারো কারো আবার যেটুকু বুদ্ধি আছে, তা মস্তিষ্কে নয়, আছে অন্যখানে।

বিমান যখনই বাইরের কোনো এজেন্সির সঙ্গে কোনো বিষয়ে চুক্তিপত্র করে, তখনই দেখা যায়, চুক্তির শর্তাবলীর মাঝে এমন কোনো ফাঁকফোকর থেকে যায় যে, এর জন্য প্রতিবারই বিমানকে বড় রকমের খেসারত দিতে হয়েছে। আমি বিমানের কেবলমাত্র একজন লাইন পাইলট বা ক্যাপ্টেন ছিলাম। অনেক কিছুই আমার জানা নেই। তারপরও বোকার মতো চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বিমানকে প্রচুর খেসারত দিতে দেখেছি। আমি এ ধরনের অনেকগুলো চুক্তির কথাই জানি, যার সবগুলো তুলে ধরলে তো এ লেখা আরো অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই শুধু একটা উদাহরণ তুলে ধরবো, যাতে করে মূর্খতা এবং অসততা দুটো বিষয়ই জানানো যায়।

এরশাদ সাহেবের সময়ের ঘটনা তুলে ধরাকেই এখানে আমি নিরাপদ মনে করি। বর্তমানের কোনো কথা বলতে গিয়ে নিজের ঘাড়ে বিপদ টেনে আনার মতো বোকামি করা কী উচিত, বলুন?

এরশাদ সাহেবের আমলে একবার বিমানের এমডি ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের মধ্যম সারির একজন অফিসার। আগে যে ধর্মপুত্রের কথা বলেছি, তিনি ছিলেন ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশ বিমান অ্যারোপ্লেনের একটা পুরানো ইঞ্জিন হংকংয়ের কোনো এক কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছিল ২৫ লাখ ডলারে। ক্রয়-বিক্রয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে দু'জন প্রকৌশলী ছিলেন। তারা বললেন, ইঞ্জিনটির দাম আরো কিছু বেশি হওয়া উচিত। এমন মন্তব্য করায়, ধর্মপুত্র যিনি ক্রয়-বিক্রয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি প্রকৌশলী দু'জনকে বাদ দিয়ে একা একাই বিক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। গা বাঁচানোর জন্যে এমডি সাহেব সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। ওই বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা কোম্পানির অনুরোধে ছোট একটা শর্ত যোগ করা হয়েছিল। শর্তটি হলো, যে ইঞ্জিনটা হস্তান্তর করার আগে ৫০০ সাইকেল সম্পন্ন করে দিতে হবে।

ইঞ্জিনের পূর্ণশক্তি ব্যবহার করে একটা টেকঅফ এবং ল্যান্ডিংয়ের পর রিভার্স শক্তিতে ইঞ্জিনের পূর্ণশক্তিকে একবার ব্যবহার করা এই দুটো মিলিয়ে হলো ইঞ্জিনের একটি সাইকেল। ৫০০ সাইকেল সম্পন্ন হওয়ার অর্থ ওই ইঞ্জিনটা নিয়ে অ্যারোপ্লেন যেন ৫০০ বার ল্যান্ডিং-টেকঅফ করতে পারে। বিমানের যে ইঞ্জিনটা বিক্রি করা হয়েছিল, ওটার তখন দশ বা বারো সাইকেল বাকি ছিল। ইঞ্জিন ওভারহল (Overhall) করে ওটাকে ৫০০ সাইকেল সম্পন্ন করে দিতে বিমানের খরচ হয়েছিল আড়াই লাখ ডলার। এই বাড়তি খরচের জন্যে যথেষ্ট সমালোচনা হওয়ায় সম্ভবত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একটা এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করতে বিমান বাধ্য হয়েছিল।

তদন্ত করতে যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, বিমানের এমডি তাকে ডেকে নিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে ধর্মপুত্র দোষী প্রমাণিত হবেন সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি আসল দোষী নন। 'ইঞ্জিনের সাইকেল' এই টেকনিক্যাল শব্দটি তিনি বুঝতে পারেননি। প্রকৌশলী সদস্য দু'জনের পরামর্শেই তিনি অমন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অর্থাৎ এমডি সাহেব দোষীকে বাদ দিয়ে ইঙ্গিত দিলেন, নির্দোষ প্রকৌশলীদ্বয়কে ফাঁসাও। ধর্মপুত্রকে এমডি সাহেব কেমন ভয় করতেন, এ কথা আশা করি পাঠক ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন!

তদন্তকারী কর্মকর্তা কী রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা আমার জানা নেই। ধর্মপুত্র কী টেকনিক্যাল ট্যারমিনলজি বুঝতে পারেননি? না, পারিতোষিকের পরিমাণটা এমন ছিল যে ওই ট্যারমিনলজি বোঝার পথ রুদ্ধ করেছিল, বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাহেবও পারিতোষিকের একটা অংশ বা হিস্যা পেয়েছিলেন কিনা, এসব

অবশ্য আমি জানতে কখনো চেষ্টা করিনি।

অযোগ্য লোকরা কেমন করে বিমানের কর্মকর্তা পদে নিয়োগ অথবা পদোন্নতি লাভ করেন? এর অনেকগুলো কারণ শনাক্ত করা যেতে পারে। এর মধ্যে দলীয়করণই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়।

বিমানে অযোগ্য কর্মকর্তাদের এমন ভিড় কেন? কারণ সরাসরি অফিসার পদে নিয়োগদান না করা। সরকারের প্রতিটা বিভাগে অর্থাৎ সামরিক- বেসামরিক সবখানেই তো সরাসরি অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। তবে বিমানে কেন তা করা হবে না? সরাসরি অফিসার নিয়োগদান না করার ফল, পদোন্নতি দেয়ার সময় প্রায়ই সঠিক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় না। অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগদানের সময় বিমানের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করে অগ্রাধিকার দিলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যারা নিম্নপদে চাকরি করছেন, তাদেরকে সরাসরি অফিসার পদের জন্যে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিলে সিনিয়রিটির গ্যাড়াকল থেকে তারাও মুক্তি পাবেন। অবশ্য বিমানকে বেসরকারিকরণের পরেই এই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা উচিত। নতুবা দলীয়করণের বদৌলতে অযোগ্যরাই যোগ্য প্রার্থীদের টপকে যাবেন।

মোট কথা, বিমানকে বাঁচাতে হলে বিমানের বেসরকারিকরণ করতেই হবে। এর বিকল্প অবশ্যই নেই।

এবার আবার আমাদেরই দেশের বেসরকারি খাতে জিএমজি এয়ারলাইনের কথা বলছি। ভোরের কাগজ পত্রিকার একটা প্রতিবেদনে একবার পড়লাম, অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের যে সব রুটে বিমান লোকসান দিচ্ছে এবং লোকসানের জন্যে ফ্লাইট বন্ধ করছে, ওইসব রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করেই জিএমজি এয়ারলাইন মুনাফা অর্জন করছে।

আমার মনে হয় অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট অপারেট করার জন্যে যেমন অনুমতি দেয়া হয়েছে, তেমনি কিছু কিছু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অপারেট করার জন্যে জিএমজির মতো বেসরকারি এয়ারলাইনকে পূর্ণ দায়িত্ব বা অনুমতি দেয়া উচিত। এর ফলে তারা বিমানকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবে, কী ভাবে কেমন করে লাভজনকভাবে এয়ারলাইন পরিচালনা করতে হয়।

যখন জিএমজি এয়ারলাইন চালু হলো, তখন অনেকেই বললো, ওই এয়ারলাইনের মালিক শাহাব সাত্তার অবাঙালি। তিনি কতোটুকু বাঙালি বা অবাঙালি সে বিষয়ে আমিই জবাব দিচ্ছি :

বছর খানেক আগে এশিয়াটিক সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনের কথা প্রসঙ্গে বললেন, ১৯৬৩ সালে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাসে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। ওই উপলক্ষে তাদের বাসায় এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শাহাব সাত্তারের বাবা উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু উপস্থিত থাকলে অবধারিতভাবে রাজনৈতিক আলোচনা তো হবেই। বলেছিলেন, এ দেশটাকে বাঁচাতে হলে এটাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

শাহাব সাত্তারের বাবা বঙ্গবন্ধুকে একবাক্যে সমর্থন জানালেন। তারপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে সব আন্দোলনকে তিনি সব সময় অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

যার পিতা এই দেশের স্বাধীনতাকে সেই ১৯৬৩ সাল থেকেই সমর্থন করেছেন, তাঁর পরিবার যদি বাঙালি না হয় তবে কাকে বাঙালি বলবো জানি না! শাহাব সাত্তার বিয়েও করেছেন বাঙালি মেয়ে। তাই জোর দিয়ে বলা যায়, ওই পরিবার খাঁটি বাঙালিদের চাইতেও অনেক খাঁটি। ওই পরিবার এই দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে অর্থপাচারও করেনি। ইস্পাহানি পরিবারের মতোই খুব সততার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রেখেছে।

শাহাব সাত্তার খুব উচ্চশিক্ষিত মানুষ। ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাঁর জন্মগত। যে প্রতিকূল অবস্থায় শুরু করে জিএমজি এয়ারলাইনকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর মেধার পরিচয় আমরা পেয়েছি। প্রাক্তন বিমান এমডি, বিমানমন্ত্রী, বর্তমান বিএনপি সংসদ সদস্য মান্নান সাহেব এঁনাদের মতো লোকদের বিমানের ব্যাপারে সম্পৃক্ত করতে পারলে বিমান হয়তো বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারতো।

মীর নাছির সাহেব পদত্যাগ করেছেন, এটা বিমানের জন্য বড়ো সুখবর ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়েছে, বিগত ৪ বছরে তিনি তিনশো থেকে চারশো কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। আমার বিশ্বাস এর এক দশমাংশের বেশি তিনি পাননি। বড়ো অংশের অর্থকড়ি অবশ্যই মীর নাছিরের চেয়েও শক্তিধর ব্যক্তি বিশেষই পেয়েছেন এমন ধারণা করাটা অমূলক হবে না হয়তো। না হলে এমন গলগ্রহ ব্যক্তিকে এতোদিন তাকে মন্ত্রীপদে রাখা হয়েছিল কেন? হ্যাঁ, রাখা হয়েছিল কারণ ওই শক্তিধর ব্যক্তির তিনি একান্ত অনুগত। এবার মীর্জা আলমগীর সাহেবকে বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সাবেক মন্ত্রী মান্নান সাহেবের মতো অর্থনীতিবিদকে উপেক্ষা করে। এতে করে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, মীর সাহেবের মতোই মীর্জা সাহেবও মহাশক্তিধর ব্যক্তি বিশেষের অনুগতই হবেন।

৯ অথবা ১০ ফেব্রুয়ারি বিমানেরই একজন পাইলট বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। আমি কিছুদিনের জন্যে আমেরিকায় গিয়েছিলাম, তিনি তা জানতেন। তাই প্রশ্ন করলেন, কবে ফিরে এসেছি। বললাম, আসার কথা ছিল ৩১ জানুয়ারি। সেই ফ্লাইট বিলম্বিত হয়ে এসেছে ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ সকালে। ওই বিলম্বিত ফ্লাইটেই এসেছি। অন্যান্য যাত্রীদের অপেক্ষা-দুর্ভোগ আর বিড়ম্বনার কথাও তাকে বললাম। পাইলট বন্ধুবর বললেন, বিমানের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থার আর তুলনা হয় না। এই বলে তিনি আরো বললেন, বিমানের কোনো ফ্লাইটই এখন আর শিডিউল মতে চলে না। দু'এক দিন পর যোগাযোগ করবেন। আপনাকে কিছু কাগজপত্র দেবো। ওই কাগজপত্রে উল্লেখিত পরিসংখ্যান দেখেই বুঝতে পারবেন, বিমানের সর্বশেষ অবস্থা কেমন যাচ্ছে?

১২ ফেব্রুয়ারি বন্ধুবরের বাসায় গিয়ে ফ্লাইট সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের কিছু নথিপত্র নিয়ে এলাম। ওই নথিপত্র অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ০৬ তারিখ পর্যন্ত এক সপ্তাহের খতিয়ানে দেখা যাচ্ছে বিমানের ৪১টি ডিসি-১০ ফ্লাইটের একটা ফ্লাইটও সঠিক সময়ে চলাচল করেনি। ৪১টি ফ্লাইটের মাত্র একটি ফ্লাইট ছাড়তে অল্প বিলম্ব হয়েছে, আর বাকি ৪০টি ফ্লাইট ছাড়তে প্রচুর বিলম্ব হয়েছে বা ক্যান্সেল হয়েছে। উক্ত সময়কালে এয়ারবাসে ৩১০-এর ১১৬টি ফ্লাইটের মধ্যে মাত্র ১৭.২% ফ্লাইট নিয়মিত সময়ে চলাচল করেছে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলোর অবস্থাও ছিল তথৈবচ। পরের সপ্তাহ অর্থাৎ ০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিমানের ৬৭টি ডিসি-১০ ফ্লাইটের মধ্যে মাত্র ১টি নিয়মিত সময়ে চলাচল করেছে। এয়ার বাস প্লেন দিয়ে পরিচালিত ৯৬টি ফ্লাইটের মাঝে মাত্র ১৬টি চলেছে নিয়মিত সময়ে। ২২ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ফ্লাইট শিডিউলের চিত্রও ছিল একই রকম। একটানা ২১ দিন যাবৎ বিমানের ডিসি ১০ দ্বারা পরিচালিত একটি ফ্লাইটও সময় মতো ছাড়েনি।

আমি আর বেশি তথ্য পরিবেশন করে কাউকে বিব্রত করতে চাই না। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পাইলট ক্যাপ্টেন সেকেন্দার আলী, শহীদ ক্যাপ্টেন আলমগীর, শহীদ ক্যাপ্টেন আমিরুল ইসলাম, শহীদ ক্যাপ্টেন এনএস হায়দার এনাদেরকে নিয়ে একদিন একটি লাভজনক এয়ারলাইন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলাম। আর আজ সেই এয়ার লাইনের এই বেহাল অবস্থা!

বিমানের বর্তমান অবস্থার জন্যে, শহীদদের স্বপ্নপূরণে ব্যর্থ হওয়ার জন্যে বিমানের সমস্ত সৎ কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিমানের একজন অবসরপ্রাপ্ত বৈমানিক হিসেবে দেশবাসীর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে এ লেখা শেষ করছি।

আমরা বিপদে পড়লে বা ভয় পেলে যথেষ্ট দোয়া-কালাম পড়ি এবং অনেক সময় তা পড়ে নিজ নিজ বুকে ফুঁ দিয়ে থাকি। বাংলাদেশ বিমানে চড়লে যাত্রার প্রাক্কালে সহযাত্রীদের যেভাবে দোয়া-দরুদ পড়তে দেখি তাতে মাঝেমধ্যে ভয় পেয়ে যাই